Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

"...বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণবার্তা

সম্পাদকীয় ১
পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তক্ষয় বন্ধ করতে বামেদেরই ভূমিকা নিতে হবে ১
দেশে-বিদেশে ২
পুঁজিবাদী সংকট ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ ৩
২০২৩-এ আর এস পি যে পঞ্চায়েত চায় ৫
অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে বামফ্রন্টের প্রস্তাব ৭
তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পানিহাটি পৌরসভার দুরবস্থা ৮

70th Year 34th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 8th July 2023

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েতে সংঘর্ষ ও নির্মাণ

৮ জুলাই পঞ্চায়েতে নির্বাচন। ইতিমধ্যেই প্রার্থীপদের আবেদন, স্ক্রুটিনী, প্রত্যাহার এবং প্রচারপর্বে উনিশজন নিহত, কয়েক হাজার আহত এবং আইন শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে কয়েক হাজার, যারা অধিকাংশই বামপন্থী বা কংগ্রেস কিংবা আই এস এফ-এর সমর্থক, অভিযুক্ত। পরবর্তী দুটি পর্বে, ভোট দান ও গণনার দিন কি কি ঘটবে সহজেই অনুমেয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন, পুলিশ আমলাতন্ত্র তৃণমূল বিজেপি'র দুষ্কৃতীচক্র, বিচারব্যবস্থার ঘন ঘন হস্তক্ষেপ, রাজ্যপালের অতিসক্রিয়তার আবহে ভোটের অধিকারের বিষয়গুলো ইতিমধ্যেই অনেকটা ঘেঁটে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বামগণতান্ত্রিক শক্তি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় অনেকটাই শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বামগণতান্ত্রিক দলগুলোর উত্থাপিত দুর্নীতির অবসান সহ কর্মসংস্থান ও বিকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গ্রামের মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিল কিন্তু সীমাহীন সন্ত্রাস রক্তপাত, সরকারি নিপীড়নের ধারাবাহিকতা এবং পাশাপাশি বিভিন্ন রিলিফের মাধ্যমে এক ধরনের বিকৃত সমাজচেতনার সৃষ্টি করছে বিজেপি ও টি এম সি। আমাদের উত্থাপিত ভূমি ও কৃষি সংস্কার, পরিবেশের ভারসাম্য সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া অস্পষ্ট করতেই এই বাইনারির পুনর্নির্মাণ। একটি আঞ্চলিক দুর্বৃত্ত প্রভাবিত দলের বিকল্পে যেন বরাভয়ের আশ্বাস দিচ্ছে সর্বভারতীয় স্যাঙাৎ পুঁজিপতিদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। দুটি দলই জনপ্রতিনিধিদের প্রলুব্ধ করে নিজেদের কোলে টেনে নিতে সিদ্ধহস্ত। প্রকৃত সত্য, গত এক দশকে গ্রামবাংলার রাজনৈতিক পরিসরে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সহজ সুচেতনাবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। ক্রমাগত কৃষির বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বিরাট অংশের মানুষ গ্রামীণ সর্বহারায় পরিণত হচ্ছেন। ৬৬ শতাংশের নিজের জমি নেই। ৯৫ শতাংশের জমি এক হেক্টরেরও কম। কৃষির খরচ বেড়ে যাওয়ায় কৃষক পরিবারের কৃষি থেকে মাসিক আয় গড়ে মাত্র ১৫৫০ টাকা। যেখানে দেশের গড় ৩৮০০ টাকা। বামপন্থীদের কাছে অসমাপ্ত ভূমি ও কৃষি সংস্কার, গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি ও নিরাপত্তা, পরিবেশের ভারসাম্য এবং গণস্বাস্থ্য বা শিক্ষার সমস্যা ঘিরে তীব্র গণআন্দোলনের পরিবেশ নির্মিত হয়েছে। অথচ খন্ড খন্ড লড়াই ও কোনো কোনো পকেটে জঙ্গি সংগঠন গড়ে উঠলেও রাজ্যের এই দূষিত বাইনারি ধ্বংস করার স্তরে উন্নীত হয় নি। কৃষি ও শিল্পে কর্মসংস্থান নেই, সরকারি পদে নিয়োগ নেই। যা আছে দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন। একদা গ্রামে এই সব শিক্ষিত সরকারি কর্মচারীরা দায়বদ্ধ হতেন বামপন্থী আন্দোলনে। সেই শূন্যতা তৃণমূল পূরণ করছে সিন্ডিকেট আমলা পুলিশ নেতা প্রভাবিত দুর্বৃত্তায়নের দ্বারা। ২০১৬ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের দুর্বৃত্ত নব্যধনিক-এর দঙ্গল গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতির ড্রাইভারের আসন দখল করেছে। কৃষি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পরিসরে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত কমায় বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিক। আর যেহেতু মহিলাদের ৭০ শতাংশ পারিবারিক চাষবাস ও পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অনেকটা দক্ষিণ ভারতের ধাঁচে তাদের কাছে তাঁদের নামে নগদ টাকা পাঠিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই দুর্বৃত্তায়নের ফলে ২০১৮ সালের তুলনায় সর্বস্তরে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের সম্পদ বেড়েছে ৪০ গুণ। এই টাকার ছিঁটেফোঁটা খরচ করে গ্রামের যুবকযুবতীদের নিয়ে দুবৃত্ত বলয়ের পুনরুৎপাদন চলছে।

আশার কথা নির্বাচনপূর্ব গণআন্দোলন এবং এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতিটি কর্মসূচিতে বামপন্থী ছাত্র যুবকদের অংশগ্রহণ এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির ধাঁচ ও শ্রেণিবিন্যাস বদলের ফলে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বামপন্থীদের কাছে শ্রেণিসংগ্রামে উন্নীত হতে বাধ্য। গ্রামীণ বেকার ও সর্বহারা শ্রেণিকে প্রতিক্রিয়ার বলয় থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র বিকল্প উন্নয়নের নির্মাণ নয়, সংঘাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে শ্রমিক কৃষক মহিলা ছাত্র যুবকদের যুক্ত করে তীব্র গণআন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রামের পদক্ষেপ করাটাই একমাত্র বিকল্প। সংঘর্ষ ও নির্মাণ। নির্মাণ ও সংঘর্ষ। ভোটের ফলাফল যাই হোক না কেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তক্ষয় বন্ধ করতে বামপন্থীদেরই কঠোর ভূমিকা নিতে হবে

এমন অবাধ হিংসাশ্রয়ী পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঐতিহ্য তৃণমূল কংগ্রেসের একতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তা থেকে মুক্তির পথ সন্ধান এখন সর্বাপেক্ষা জরুরি। গ্রামীণ মানুষের জন্য গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচনী ব্যবস্থা। সেই পথে নির্বাচনের ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই কমপক্ষে ১৯ জন মানুষের জীবনহানি। এই মানুষগুলি কে, কোন দলের তা, গুরুত্বপূর্ণ নয়। সকলেই মানুষ এবং গরিব মানুষ। এতটুকু সংবেদনশীলতা রাজ্যের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের নেই। তারা লুঠতরাজ, দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেই সক্রিয়। রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন কোনও মর্যাদাই এদের কাছে পায় না।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ করে বামপন্থীদের কতজনকে যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মহান কাজে শহীদ হতে হবে তার কোনও নিশ্চিত সংখ্যা অনুমান করাও অসম্ভব। বামপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গেই নৌসাদ সিদ্দিকির দল আই এস এফও ডাকাতদের আগ্রাসন রুখতে আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং হয়তো আরও বেশি সংখ্যক বাম-কংগ্রেস এবং আই এস এফ-র কর্মী ও নেতাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় রথ চালানোর অপচেষ্টা হবে। ভোট গ্রহণ প্রহসনে পরিণত হতেই পারে। পুলিশ প্রশাসন এবং বড় বড় প্রশাসনিক কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর মতো স্বৈরাচারীর নির্দেশেই এমন মানবিকবোধ বর্জিত অপকর্ম করবে।

বিজেপি আর তৃণমূলের দ্বৈরথ প্রচারে গোদি মিডিয়া মহাব্যস্ত। অমিত শাহ'র নির্দেশ মান্য করতে মমতাপন্থী টিভি চ্যানেলগুলি উদ্‌গ্রীব। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন বিজেপিকে জিতিয়ে দিতে মমতা ব্যানার্জীর বিশেষ উৎসাহ।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বমোট ৩৪১টি ব্লকের প্রায় সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসের চরম আধিপত্যবাদ চলছে। মুখ্যত দুর্বৃত্ত এবং পুলিশ বাহিনীর আঁতাত সাধারণ জনজীবনকে অতি তুচ্ছ কারণেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পঞ্চায়েত ক্ষমতা দখল করে গ্রামের মানুষদের দাসানুদাসে পরিণত করার প্রবণতা প্রথম দিক থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস চালিয়ে এসেছে। মনে পড়ে, বামফ্রন্টের অবক্ষয়কালে নয়। একেবারে প্রথমদিকে, বলতে গেলে গত শতাব্দীর ৮০'র দশকের কালে কংগ্রেস দলের হৃত-গৌরব নেতারা প্রায়ই বলতেন যে, বামপন্থীরা ছোটলোকগুলিকে মাথায় তুলে ঘোর অন্যায় করছে। এরা গ্রামে গ্রামে জমির অধিকার দিয়েছে ভূমিহীন কাঙালদের আর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করে ওইসব কাঙালদেরই নেতার আসনে বসিয়েছে। এ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ছিল।

শ্রেণিগতভাবে গ্রামীণ জোতদার জমিদারদের প্রতিভূ ছিল কংগ্রেস। ভূমি সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়নে গ্রামের হুজুর শ্রেণির মাহাত্ম্য বা খবরদারি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। গরিব গুর্বো মানুষরা প্রশাসন পরিচালনায়। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বামুন কায়েত বদ্যিরা হাত কচলে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে এটা কংগ্রেস দলের মাতব্বরদের কাছে অতি অস্বস্তিকর বিড়ম্বনা। সহ্যাতীত।

অনস্বীকার্য, ওই কংগ্রেস দলের সবচাইতে উগ্র অংশটিই একসময় তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করে। ১৯৯৮ সালে সারা দেশে রাজনৈতিক ডামাডোল। তার মধ্যেই সমস্ত ধরনের নীতি নৈতিকতা শিকেয় তুলে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে পথ চলা শুরু মমতা ব্যনার্জীর। গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণির মানুষরা নিজেদের হারানো সম্পত্তি ফিরে পাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মমতা ব্যানার্জীর কাছে ভিড় বাড়াতে থাকে। কারণ, মমতা ব্যানার্জীই তো বামফ্রন্ট সরকারের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে সুদূর ১৯৯৩ সালে শোরগোল তুলেছিলেন।

তিনিই পারবেন আবার সমস্ত জোতদারদের দখল হওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে। গ্রামের একদা উচ্চবিত্ত, যারা বামফ্রন্টের বহুমুখী কর্মকাণ্ডে কিছুটা বিত্তহীন হয়েছে তারা নতুন আশায় বুক বেঁধে মমতার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এরাই তো একদা গণতান্ত্রিক অধিকারের সবটা ধ্বংস করে দীর্ঘকাল গ্রামের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের ক্ষমতাহীন করে বামপন্থীরা অন্য পথে চলার চেষ্টা করেছিল। সুতরাং এই অংশটির প্রবল রাগ ক্ষোভ বিদ্বেষ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে।

মমতা ব্যানার্জীর তীব্র বাম বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গের একদা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মাতব্বর শ্রেণির মানুষদের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল। দুর্বৃত্ত নির্ভরতা তৃণমূল কংগ্রেসের জিনগত। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এত মারামারি খুনোখুনি তো আসলে শ্রেণিগত স্বার্থরক্ষার অদম্য প্রচেষ্টা। তারা চাইছে যে করেই হোক, গ্রামীণ প্রশাসনের ক্ষমতা ধরে রাখতে। বামফ্রন্ট সম্পর্কে অনেক বিরূপ সমালোচনা থাকতেই পারে। শ্রেণি সমন্বয়বাদী চিন্তাভাবনাও হয়তো অনেককে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু শ্রেণি আনুগত্য পুরোপুরি পালটে যায়নি।

—এরপর ৪ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে

অঘটন কিছু ঘটার কথা নয়, গত পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে ছিল এবারও ব্যতিক্রম হবে না বলেই মনে হয়। তবে এবার তৃণমূলের জয়লাভ যতটা মসৃণ হওয়ার কথা কথা, ততটা সহজ হবে না। ভোটে জেতার জন্য শাসক দল বুথ দখল থেকে শুরু করে, সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট, তার কোনটাই ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না, এদিকে কেন্দ্রীয় সশস্ত্রবাহিনী এই রাজ্যে এসে পড়লেও শেষপর্যন্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান কতদূর সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকছেই। পঞ্চায়েতরাজের সব স্বপ্ন বিফল করে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে উঠেছে বেপরোয়া সমাজ বিরোধীদের ভৈরব নৃত্যের খোলা মঞ্চ, অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা, ভোট সন্ত্রাস সারা দেশেই এক সাধারকণ ঘটনা, সময়ের সাথে সাথে ভারতীয় গণতন্ত্রের নগ্ন চেহারাটা ক্রমশ পঞ্চায়েত নির্বাচনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের বিকেন্দ্রীকৃত প্রত্যক্ষ সুশাসনের স্বপ্ন অলীক রয়ে গেল, যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন।

মমতা জমানায় বিগত বছরগুলিতে মমতা শাসনের বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চায়েত নির্বাচনেরও বেশ প্রকট। বর্তমানের মমতা জমানায় সরকারি কাজের পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান। দলতন্ত্র পরিণত হয়েছে তৃণমূলী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়। স্বভাবতই এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান সর্বত্রই।

প্রশ্ন হল, এত কাণ্ডের পর যে নতুন পঞ্চায়েত ক্ষমতাসীন হবে, তার ভবিষ্যৎ কী হবে। স্বীকার করতে সংকোচ নেই, সাধারণ মানুষের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রতি খুব একটা আস্থা বা ভক্তি শ্রদ্ধা নেই—সাবেক প্রশাসনের উপর নির্ভর করেই ডি এম বা এসডিও-দের অঙ্গুলি নির্দেশে চালিত পঞ্চায়েতীরাজে পঞ্চায়েতের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা থাকবে কিনা সেই ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ থাকবেই।

দ্বিতীয়ত একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উল্লেখ করতেই হচ্ছে, সামগ্রিক পরিস্থিতি যে অবনমন ঘটেছে, তাতে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে পঞ্চায়েত কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ, শাসককুল উন্নয়ন প্রশ্নে পঞ্চায়েতকে প্রকৃত গুরুত্ব দেয় কি?

আসল কথা, বিশ্বায়ন প্রভাবিত নয়া উদারনীতির অর্থনীতিতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রকৃত ভূমিকা থাকতে পারে না, এই সত্যটা স্বীকার করতেই হবে।

বাধ্য হয়েই ভারতকে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে (SCO) যোগ দিতে হল

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎত্তম ভূখণ্ড ভারত মধ্য এশিয়ার রাজনীতি অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত থাকতে পারে না। অনুষ্ঠিত SCO-র শীর্ষ সম্মেলনে SCO -র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে নানা বিষয়ে দিল্লীতে ভারতের মতানৈক্য বেশ স্পষ্টই ছিল। গিলগিট বালুতিস্তান পাক অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর এবং দক্ষিণ এশিয়া ভারতের প্রভাবকে এক বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। SCO প্রসঙ্গে ভারতের বর্তমান শাসককুল এমনই মনে করে। ভারতের ভাবনায় চিনের Belt and Road Initiative এর অন্তর্গত দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে চিনের যোগাযোগ প্রকল্পগুলি ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে। Belt and Road Initiative এর প্রকল্পগুলির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে SCO অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের মতানৈক্য এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, ভারত এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিল্লীতে ঘোষিত সিদ্ধান্তে অসম্মতি জানিয়েছে। SCO -র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যেও পৃথক মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে ভারত এখনও স্পষ্ট কোনো মতামত ব্যক্ত করেনি। সীমান্তরেখা লঙ্ঘন করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রসঙ্গে SCO র অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো দেশের অনুসৃত নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছে ভারত। ভারতের দাবি SCO কে এমন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত চিন প্রভাবিত গোষ্ঠী দেশগুলি এখন সন্ত্রাসবাদী এবং চরমপন্থী সংগঠনগুলির একটি পৃথক তালিকা নির্মাণ করছে, কিন্তু মজার ব্যাপার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের এমন এক তালিকার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ফের পৃথক একটি তালিকার কেন প্রয়োজন, বোধগম্য হচ্ছে না। এই তালিকা তৈরির সময় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ হিসাবে চিনেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে কেন আর একটি নতুন তালিকা প্রয়োজন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া SCO তে ইরানের অন্তর্ভুক্তি ভারতের পক্ষে বিশেষ অস্বস্তির কারণও বটে। একদিকে ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা এবং চিন রাশিয়ার দৃঢ় মৈত্রী সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মধ্য এশিয়ার আর্থ রাজনীতিতে Belt and Road Initiative এর কর্মকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বন্ধু রাষ্ট্র ভারতকে কি আগামী দিনে এই অঞ্চলে আরও নিঃসঙ্গ করবে—এই প্রশ্নটাই রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এতদসত্ত্বেও কৌতূকের বিষয়, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এমনই যে ভারতকে BRI প্রকল্পে যোগ দিতেই হয়েছে।

ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা

শিবসেনার ভাঙ্গনের মাত্র কয়েক মাস পরই গত ২ জুলাই শরদ পাওয়ারের দল এন সি পি'র ন'জনের মধ্যে চারজন এম এল এ ভাঙ্গিয়ে বিজেপি মহারাষ্ট্রে দলের নিজস্ব সরকার গঠন করে রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের আর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। প্রসঙ্গত এই সমস্ত এম এল এ মহোদয়গণের (?) বিরুদ্ধে নানা কেলেঙ্কারীর সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা Anti Corruption র ব্যুরোর তদন্ত চলছে।

বেশি দিনের কথা নয়, অজিত পাওয়ার সহ আরও কয়েকজন এম এল এ-র বিরুদ্ধেই ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় বিজেপিরই অভিযোগ ছিল। এই অতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের জীবন্ত প্রতীক। এখন বিস্ময় জাগে যেন কোনও এক অদৃষ্ট যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় এরা রাতারাতি দুর্নীতিমুক্ত পবিত্র মানুষের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মানুষগুলির সর্বাঙ্গ এখন দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচারের ভাইরাস মুক্ত করা হয়েছে। কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রই নয়, সারা ভারতেই সংসদীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় একই কুনাট্যের প্রদর্শনী চলছে। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি'র ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলটি সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী শূন্য করার লক্ষ্যে সংসদীয় রাজনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

মহারাষ্ট্রে ২০১৯ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপি নানা উপায়ে রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে অবিরাম রাজনৈতিক ঘুঁটি চালিয়ে যাচ্ছিল। নির্বাচনের পর অবশ্য শরদ পাওয়ার কোনও মতে MVA গঠন করে বিজেপি'র উপর টেক্কা নিয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাক্রমে দেখা গেল, ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা রাজ্যগুলির মতই বিজেপি অনুসৃত কৌশলের কাছে শরদ পাওয়ারকেও হার স্বীকার করতে বাধ্য হতে হল। আগামীদিনগুলিতে মহারাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে তাঁর দুই সহচর উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে নিয়ে রাজ্যশাসনে কতটা সাফল্য অর্জন করেন তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। তবে ভাঙ্গাগড়ার রাজনীতির কুশলী খেলোয়াড় শরদ পাওয়ারকেও হিসাবের মধ্যেই রাখতে হবে।

সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে, মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘটনায় আগামী সাধারণ নির্বাচনের বিজেপি বিরোধী মহাজোট গঠনের প্রচেষ্টার উপর এক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অনস্বীকার্য। ঘটনা বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের অন্যতম মানুষ শরদ পাওয়ারের ভূমিকা খানিকটা হলেও খাটো হতে পারে।

দাঙ্গা কবলিত ফ্রান্স

অভূতপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব ঘটনাবলিতে উত্তাল ফ্রান্স। উপলক্ষ উত্তর আফ্রিকার বংশদ্ভুত ১৭ বচেরর জনৈক কিশোরের পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনাকেই এই দাঙ্গার প্রাথমিক কারণ বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই দাঙ্গা সমগ্র ফ্রান্সে তো বটেই, এমনকি ফ্রান্সের সীমানার বাইরেও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে জনৈক পুলিশ অফিসারের গুলিতে নাহেলের দুঃখজনক মৃত্যুর ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়ে এবং ভাইরাল হওয়ার পর প্রথমে প্যারিসের শহরতলীতে এবং পরে সারা দেশেই হিংসাত্মক ঘটনাবলি ছড়িয়ে পড়ে। স্পষ্টতই নাহেলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুঘটক হিসাবেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাঙ্গার কাজ করেছে। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁকড় এবং তাঁর সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতাই ঘটনার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৭ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট মাঁকড়ের জমানায় একের পর এক প্রতিবাদ আন্দোলনের কবলে গোটা ফ্রান্স। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং বড়লোকদের ট্যাক্স ছাড়ের বিরুদ্ধে Yellow Vest বলে কথিত এই আন্দোলন খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ বছরের শুরুতে মাকঁড়র পেশনন সংস্কার এবং অবসরের বয়স ৬২ থেকে ৬৪ করার প্রতিবাদে ফ্রান্সের নাগরিকবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। দেশজুড়ে ধর্মঘট ফ্রান্সের অর্থনীতিতে ব্যাপক আঘাত হেনেছিল। তারপর পুলিসের গুলিতে নাহেলের নিহত হওয়ার ঘটনার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ থেকে আগত নাগরিকদের প্রতি বৈরীমূলক মানসিকতাকেই এই নৃশংস আচরণের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। নাগরিকত্বের অধিকার সম্পর্কে ফরাসীদের ধ্যানধারণা প্রগতিশীল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও এবং সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা রক্ষার মৌলিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বহু ভাষী এবং বহু সংস্কৃতির দেশ হিসাবে ফ্রান্সকে স্বীকৃতি দিতে অনেকের আপত্তিও বাস্তব সত্য এবং ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সহজ ঘটনা নয়।

বস্তুত প্রেসিডেন্ট মাঁকড়ের দ্বিতীয় দফার শাসনকালে বাজার বান্ধব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ফ্রান্সের নাগরিকেরা খুব একটা স্বস্তিতে নেই বলেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্টের প্রতি জনসমর্থন লক্ষ্যণীয়ভাবেই কমেছে। একদিকে যেমন উগ্র দক্ষিণপন্থীদের উত্থান ঘটেছে, অপরদিকে বামপন্থীদের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। মাঁকড় জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে অশান্ত ফ্রান্সকে ঠাণ্ডা করতে চাইলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না, এবং বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

পুঁজিবাদী সংকট ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

১৬ মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেল ইউক্রেনের সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক আগ্রাসন এবং পরবর্তী ধ্বংসলীলা, রাশিয়া বনাম ইউক্রেন বকলমে ন্যাটো জোট। প্রতিদিন দুনিয়া জুড়ে টেলিভিশন সহ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী সংবাদপত্রে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সংবাদ। আর সেই সব সংবাদকে নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় কয়েকটি ভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণে বিতর্ক।

এই সব সংবাদের ও দুটি পক্ষের বিবাদের মধ্য থেকে সারসংক্ষেপ সংগ্রহ করতে গেলে দেখা যায় আমেরিকা বা রাশিয়ায় রাষ্ট্রপতিরা একটি বিষয়কে কি বিপরীত ভাবে তুলে ধরছেন। মনেই হয় না যে এরা দুজনেই একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

যেমন পুতিন সাহেব সারা দুনিয়ায় বার্তা পাঠাচ্ছেন যে তাঁর এই যুদ্ধ প্রচেষ্টা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবতার লড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী এই যুদ্ধের জন্য।

আর ওদিকে পশ্চিমি প্রচার যন্ত্র একটি বাদ্যই বাজিয়ে যাচ্ছে—এই যুদ্ধ পুতিনের যুদ্ধ; এ এক উন্মত্ত রক্তলোলুপ রাজনৈতিক নেতা পুতিনের নিজস্ব লড়াই, ব্যক্তিগত এজেন্ডা। মার্কিনী রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন, বার বার ওয়ারশ চুক্তির সমর্থক কোটি কোটি মানুষের কাছে একটিই বার্তা পাঠাচ্ছেন, তারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ধ্বজা উত্তোলিত রাখার উদ্দেশ্যেই রাশিয়ায় মুখোমুখি যুদ্ধে ন্যাটোর মাধ্যমে সর্বশক্তি দিয়ে পুতিনকে মুখের মতো জবাব দিতে বদ্ধপরিকর।

বাইডেন বনাম পুতিন হোক, রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঢাক বাজানো বনাম বিশ্বের গণতন্ত্রের পুরোহিতের ভূমিকায় আমেরিকার পক্ষে বিশ্বের কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমের ঐকতান হোক, বর্তমান যুগে তথ্যের যুদ্ধ, ঘটনা ও বক্তব্যের বিকৃত প্রদর্শন ও উপস্থাপন ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনটি যে আসল সত্য তা বোঝাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। যে কোনো দেশের শাসক গোষ্ঠী সর্বদা নিজেদের পক্ষে জনমত সংগঠিত করা বা সার্বিক সম্মতি নির্মাণ করার জন্য সচেষ্ট থাকে, অন্তত নিজের দেশবাসীর কাছে তাদের সুকর্ম বা অপকর্ম যাই হোক, তার ন্যায্যতা গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে। যত ধরনের মিথ্যা, বিকৃত তথ্য, লক্ষ কোটি যুক্তি সাজিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে 'আমরা আক্রান্ত', 'নির্দোষ', 'ধোয়া তুলসী পাতা'। বিবদমান পক্ষরা উভয়েই বলে 'যুদ্ধে ওরাই প্রথম আগ্রাসন করেছে।' এভাবেই তাৎক্ষণিকভাবে বিবদমান শাসক গোষ্ঠীরা সর্বার্থ সঠিক প্রচারের ধূম্রজাল নির্মাণ করে।

প্রকৃত অর্থে, কে বন্দুক বা কামান থেকে প্রথম গুলি বা গোলা ছুঁড়েছিল সেই বিষয়টা সম্পূর্ণই গুরুত্বহীন। মূল কারণের ধারে কাছেও যায় না সেই 'কে আগে, কে পরে'। কে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' আর কে 'গণতন্ত্রের পূজারী'র বিষয়গুলি। আসলে যুদ্ধের আসল কারণসমূহ বিবদমান পক্ষগুলি স্বীকারই করতে চায় না।

একটি বিশেষ ধারার সংবাদ ও তথ্য, আমেরিকা-ইউরোপের তথাকথিত 'মুক্ত নিরপেক্ষ' প্রচার মাধ্যমের সূত্রে আমাদের কাছে সদাসর্বদা পৌঁছোচ্ছে। ক্রেমলিনের নায়ক আত্মম্ভরী রক্তপিপাসু ও আত্মরতির তাড়নায় ইউরোপের ধ্বংসলীলায় মত্ত। তাকে অবিলম্বে মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া দরকার। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা সচিব বেন ওয়ালেন তো তাকে সরাসরি উন্মাদ বলেই চিহ্নিত করেছেন।

আশ্চর্য মাত্র কয়েক বছর আগেই কেজিবির থেকে আর সবাই উত্থিত অতি মধ্যমেধার এই ব্যক্তিটিকেই পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদরা ম্যাকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করতেন।

আবার ওদিকে আর একদল প্রচার করছেন যে, পুতিন নাকি রাশিয়ার নতুন সম্রাট হতে চান। অনেকে একথাও বলছেন নাকি আবার তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। কোন সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই প্রশ্নে না গিয়েও বলা চলে পুতিনের সমর্থকদের মধ্যে অনেক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যক্তিই শুধুই নন, স্ট্যালিন ভক্ত আন্তর্জাতিকতাবাদীরাও কেউ কেউ রয়েছেন। যা হোক, স্ট্যালিন বা ক্রুশ্চভের আমলে শ্রমিক রাষ্ট্রটি যতই আমলাতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয়পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে যাক না কেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান কর্মসংস্থানের যথেষ্ট নিশ্চয়তা এবং অধিকাংশ শিল্প ও কৃষিক্ষেত্র যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন ছিল তা অনস্বীকার্য।

একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এবং স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত দেশগুলি আলাদা হয়ে যাওয়ার পর যেভাবে রাশিয়ায় দুর্বৃত্তনির্ভর আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা পেয়েছে একে একে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলে একদল ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, সেই রাশিয়াতে পুতিনের মতো বোনাপার্টিয় দুর্বৃত্ত দঙ্গলের সর্বময় নেতার সদিচ্ছা বা সাধ্য কোনটাই নেই, যাতে পুরনো সোভিয়েত ইউনিয়ানের শ্রমিক রাষ্ট্র নির্ভর কাঠামোটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

রাশিয়া সম্বন্ধে পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ ও কমিউনিস্টদের একটা আবেগ থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে ওয়ারশ চুক্তি এবং ন্যাটোর আগ্রাসী ভূমিকার কথা কারো অজানা নয়। বিশ্বব্যাপী সামরিক কেঈনসীয়বাদের পুনর্নির্মাণের নায়ক ইউরোপ-আমেরিকা সারা বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রের কি সর্বনাশ ঘনিয়ে আনছে সে বিষয়েও মতান্তর নেই। কিন্তু বর্তমান রাশিয়া এবং তার শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রটাই যে রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রটাকে অভিজাত আমলা নির্ভর, দুর্বৃত্তদঙ্গল প্রভাবিত বোনাপার্টিয় পুঁজিবাদ বদলে দিয়েছে সেই বিষয়টি হজম করা শক্ত হলেও, সেটাই কঠিন বাস্তবতা।

সাম্প্রতিককালে প্রিগোঝিন এবং তাঁর অধীনস্থ ভাড়াটে সৈন্যদল যে এতদিন পর্যন্ত একটি কর্পোরেট সেনাবাহিনীর ভূমিকায় পুতিনের কাছে ইউক্রেনকে হামলা করার ঠিকা নিয়েছিল সেই বিষয়টা বিশ্ববাসীর কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। ইদানীং হঠাৎ জানা গেল প্রিগোঝিনের 'ওয়াগনার' নামক কর্পোরেট সেনাদল, যাদের দেশ বা মানবতার কাছে বা সাধারণ যুদ্ধনীতির প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না তারা নাকি মস্কোর ২০০ কিলোমিটার দূরে সেনাবাহিনী দাঁড় করিয়ে পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত এবং মস্কো দখল করার হুমকি দেয়। এই প্রিগোঝিন নাকি তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলির থেকে সেনা নিয়োগ করেছে। এভাবেই যুদ্ধ নির্ভর কর্পোরেট কাঠামো ক্রমশ কর্পোরেট যুদ্ধ—অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে। আর আশ্চর্যের বিষয় যে, পুতিনকে অনেকেই বিশ্বের মুক্তিত্রাতা বলে প্রায় পুজো করতে শুরু করেছেন, তাঁরা ক্রমশ আশাহত হতে হতে নিমজ্জমান মানুষের মতো স্রোতের মুখে খড়কুটো ধরে বাঁচার মতো এখনও পুতিনের বিষয়টি সাম্রাজ্যবাদী প্রচার বলে মনে করছেন।

আসলে সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে যত যুদ্ধ হচ্ছে, বা যুদ্ধের আবহ নির্মিত হচ্ছে, তার কারণটা অর্থনৈতিক আধিপত্যের লড়াই ও পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংকট। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে তাদের লগ্নিপুঁজি নির্ভর কারেন্সী ওয়ারের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। আমেরিকা চাইছে ডলারের আধিপত্য বজায় রাখতে। অন্যদিকে রাশিয়ার রুবল, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরো, চীনের ইউয়ান। এদের মুদ্রাগুলিকে শক্তিশালী করার লড়াই। আর এই লড়াই-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ফসিল জ্বালানী তেল ও গ্যাস। রাশিয়ায় বিপুল পরিমাণ জ্বালানীর ওপর এখনও নির্ভর করতে হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নকে। তাই এখনও খোলাখুলি যুদ্ধে নামতে পারছে না। অশোধিত পেট্রোলিয়ামের ওপর এখনও ডলারের আধিপত্য বজায় থাকলেও, এই যুদ্ধের সুযোগে ভারত সহ অন্য অনেক দেশ রুবলের মাধ্যমে তেল রপ্তানি করছে রাশিয়া কর্পোরেট সংস্থাগুলি। এছাড়া জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ায় তেল সরবরাহের প্রক্রিয়ায় রাশিয়া ইউরোপ দু'পক্ষই লাভবান হত। কিন্তু এক্ষেত্রে ন্যাটোকে ঢাল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ সাধতে চায়। ন্যাটোর এই দাদাগিরি মেনে নেওয়ার পরিসরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দোটানা থাকলেও পুরোপুরি বিরোধিতার জায়গায় কিছুতেই থাকতে পারছে না।

মনে রাখতে হবে অন্য সমস্ত যুদ্ধের মতো রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধও পুঁজিবাদী সংকটজনিত যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, গৃহহীন ও দেশান্তরী হওয়া, যুদ্ধ মানেই দূষণ জল বাতাস মাটির। ভয় রয়েছে কখন ইউক্রেনের পরমাণু চুল্লির ওপর বোমা বিস্ফোরণ হয়। ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি বিস্ফোরণে ভেঙে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত। অথচ বিশ্বের বহুজাতিক সংস্থাগুলি চাইছে এই যুদ্ধ চলুক আরো দীর্ঘদিন। রাশিয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ভেঙে বা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বিস্ফোরণে কি ভয়ানক রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় দূষণ একথা ভাবছেই না যুদ্ধরত গোষ্ঠীগুলি। খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক সংকটের কথাও ভাবছে না এরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মহিলা কমিশনে ডেপুটেশন

গত ২৩ জুন চারটি বামপন্থী মহিলা সংগঠন (গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ও অগ্রগামী মহিলা সমিতি) ও মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্র করে সন্ত্রাস, মনোনয়ন দাখিল করতে না দেওয়া, মহিলাদের উপর হুমকি, তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেওয়া এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে মহিলা কমিশনকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগও তুলে ধরা হয়। মহিলা কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পূর্বে করুণাময়ী থেকে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের দলদাস পুলিশ মিছিল তো করতে দেয়ইনি বরঞ্চ নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয়, এমনকি ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামলে গ্রেপ্তার করারও হুমকিও দেওয়া হয়। অবশেষে ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি যে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী সেদিন কমিশনে ছিলেন না। মহিলা কমিশনের একজন সদস্য ডেপুটেশন নিয়ে জানান যে, সভানেত্রীকে বিস্তারিত বিষয় (যা স্মারকলিপিতে আছে ও যা আলোচনা হয়েছে) জানিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবেন। সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কমিশনের উপর মহিলা সংগঠনগুলি আস্থা রাখছে কিন্তু এ অবস্থা চলতে থাকলে এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন জারি রাখতে মহিলাদের স্বার্থে মহিলা সংগঠনগুলি পিছপা হবে না। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কম. কনীনিকা ঘোষ, কম. ডলি রায়, কম. শ্যামশ্রী দাস প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। একই সঙ্গে করুণাময়ীতে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের পক্ষ থেকে কম. শিখা মুখার্জি ও অন্যান্য সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তক্ষয় বন্ধ করতে বামপন্থীদেরই কঠোর ভূমিকা নিতে হবে

১-এর পাতার পর—

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গরিব মানুষদের একটি বড় অংশ সংঘবদ্ধ হয়েছে। তাঁরাই গ্রামে গঞ্জে প্রতিরোধের ব্যারিকেড নির্মাণ করে লড়াই-এর ময়দানে সামিল। এই বিষয়টিকে সম্ভবত প্রতিটি বামপন্থী দলকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। ওপর ওপর দেখে কোনও নির্দিষ্ট মতামতে পৌঁছানো সঠিক হবে না।

বিগত প্রায় দেড় দশককাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবেই বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। এদেশের সামগ্রিক পরিসরে বিগত এক দশককাল জুড়ে বিজেপি-আর এস এস-এর করাল ছায়া মানুষের অধিকার হরণ করে চলেছে। নির্বিচারে দেশের সংবিধান, ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ পুরোপুরি বানচাল করে ফেলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। যে অপকর্ম মোদি সরকার অতি উগ্রতার সঙ্গে করে চলেছে তা, শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই নয়, সমগ্র বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি মলিন করে চলেছে।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ভিন্নমতকে কোনও মান্যতা দেওয়া হয় না। ভিন্নমতকে দমন করার জন্য যা করতে হয় মোদি সরকার তা-ই করছে। দমবন্ধ করা এক বিষাক্ত পরিবেশ। ক্রমেই অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। হিটলার মুসোলিনি বা ইদি আমিন অথবা সুদূর চিলি রাষ্ট্রে অগুস্ত পিনোশে, ইন্দোনেশিয়ায় সুহার্তো প্রমুখ স্বৈরশাসকের দল যেভাবে ন্যূনতম মানবিকবোধ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে নিজেদের শাসন বজায় রেখেছে, নরেন্দ্র মোদিও একই পথের পথিক। সারা দেশময় তাঁর অপশাসনে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। হিংসা ও বিদ্বেষের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে একেই নতুন স্বাভাবিকতার রাজনীতি বলে পরিচিত করেছে কেন্দ্রের সরকার। শুধুমাত্র দৈত্যাকার কর্পোরেটদের দাপাদাপি। সাধারণ মানুষের স্বার্থ অর্থহীন।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নামক মুখ্যত দাগী অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত সরকারও একইরকম পথ অনুসরণ করে চলেছে। এ রাজ্যেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ পূর্ণত বিধ্বস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ প্রযোজনায় যেভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ধর্মান্ধ ঝটিকাবাহিনী বহু জায়গায় সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের কথা বলার অধিকার নির্বিচারে লোপাট করে ফেলছে, একইভাবে তৃণমূল আশ্রিত জঘন্য চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ঝটিকা বাহিনী এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে।

এক দেশ-এক পুলিশী ব্যবস্থার বাস্তবায়নে মোদি উৎসুক। তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চিতই ধর্মান্ধতাবাদের প্রসারে যেসব দুষ্কৃতি অধ্যুষিত ঝটিকাবাহিনী আগামীদিনে দেশব্যাপী তাণ্ডব করবে তাদের নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা দেবে সেই পুলিশবাহিনী। এমনও হতে পারে যে, তাঁরাই পুলিশের পোশাকে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালের পর থেকেই রাজ্য পুলিশকে মমতা ব্যানার্জীর সরকার বেশ কিছুকাল যাবৎ সেই অসদুদ্দেশ্যেই নিয়মিত ব্যবহার করে চলেছে। পুলিশ এবং প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগে ক্ষমতা ধরে রাখতে মমতা ব্যানার্জী এগাগ্র। রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে দলদাস বলে আখ্যায়িত করলে কিছুই বলা হয় না। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের সরাসরি নেতৃত্বে। তাঁরা শুধুমাত্র দুষ্কৃতী বাহিনীকে সুরক্ষা দিচ্ছেন না। প্রত্যক্ষভাবে তৃণমূলী গুন্ডাদের মতোই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসৎ আচরণ করে চলেছেন। এ এক সর্বৈব নতুন ফোনোমেনন বা প্রকল্প বলা যায়। এমন ন্যাক্কারজনক অবস্থা অতীতে কখনও লক্ষ করা যায়নি।

বেশ কিছুকাল হল রাজ্য বিধানসভা, পঞ্চায়েত বা পৌরসভাগুলিতে নির্বাচন হলেই জেলায় জেলায় পুলিশ বাহিনীর বড় কর্তাদের লক্ষ্যমাত্র বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। জেলার এস পি বা সমপদমর্যাদার অফিসারদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে বাধ্য করা হয়। ব্যর্থ হলেই শাস্তি। কম্পালসারি ওয়েটিং-এ পাঠানো হবে কিংবা অন্য কোনও অকিঞ্চিৎকর স্থানে বদলি করে দেওয়া হবে। আই পি এস অফিসাররা তটস্থ হয়ে হুকুম তামিল করেন। শোনা যায়, এমনকি শাসকদল অর্থাৎ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদ পর্যন্ত সাধারণ প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসনের বড়কর্তাদের মেটাতে হয়। আর লুটের বখরা নিয়ে তো তৃণমূল নেতা নেত্রীদের মধ্যে গন্ডগোল লেগেই আছে। সুতরাং আমলাশাহীর কর্তব্য সাধারণ আইনশৃংখলা রক্ষায় মনযোগী হওয়া নয়, শাসক দলের স্বার্থরক্ষাই চাকুরির প্রধান শর্তে পরিণত।

দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তেমন কোনও বিশেষ গুণগত পরিবর্তন আজও সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকটি কমিশন গঠিত হলেও তাদের পরামর্শগুলি ধূলায় ধূসরিত হয়ে পড়ে আছে। পুলিশি ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ক্ষুদ্রস্বার্থ চরিতার্থ করতে সব শাসকদলেরই বিশেষ উৎসাহী। নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে মানুষের স্বার্থবাহী পদক্ষেপ প্রায় অসম্ভব।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতে বহু বা সমস্ত রাজ্যেই এই দুরবস্থা চলছে। কোনও সৎ অফিসার যদি রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে, তাঁদের সঞ্জয় ভাট বা অন্য অনেক শীর্ষস্থানীয় পুলিশ আধিকারিকের মতো আজীবন বা অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবাস বরাদ্দ। পুলিশ কর্তারা প্রায় বাধ্য হয়েই এমন অনাচারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন। আবার অনেকে এই অবস্থার সুযোগে অঢেল আর্থিক বা অন্য দুর্নীতির মাধ্যমে জাগতিক বৈভব করায়ত্ত করেন। এ এক ভীতিজনক জটিলতা অক্লেশে চলেছে। মানুষের ন্যায়বিচার বা সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করার সুযোগ অতি নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকৃত হয়ে চলেছে।

এসব বিষয়ে অতীতে বেশ কয়েকবার চর্চা হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট দুয়ারে কড়া নাড়ছে বলে এ প্রসঙ্গের পুনরালোচনা। এখন তো বাংলার সর্বসাধারণই জানেন যে, এবারের ভোটে বামপন্থীরা চোখে চোখ রেখে, প্রভূত জনসমাবেশ করে এবং অনেকক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত করে ২০১৮ সালের তুলনায় বেশ কিছু বেশি আসনে প্রার্থী দাঁড় করানো সম্ভব করেছেন। ২০১৮ সালে তো বলতে গেলে কোনও ভোটই হয় নি। একান্তই প্রহসন হয়েছিল। শাসকদল যেমন খুশি, যাকে মনে হয় তাকেই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার নানা স্তরে কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। বহু অকর্মন্য এবং দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলীরা লাগাতার লুঠতরাজ করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

যে গণ্ডগ্রামে একটি দুটি মোটর সাইকেল চলতে দেখা যেত এখন সেইসব জায়গায় নামী দামী সব বড় বড় এস ইউ ভি গাড়ির রমরমা। সবই তৃণমূলী নেতা বা মাস্তানদের। বিশাল বিশাল অট্টালিকার মালিকও তারাই। একসময় নিজেদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতায় কুঁড়ে ঘরেও থাকতে পারতো না, এযুগে তারাই রাজপ্রাসাদের মালিক। উদাহরণ যত্রতত্র। বিশেষ তদন্ত বা অনুসন্ধানের কোনও মানে নেই। তবুও দু'একটি শিহরণ সৃষ্টি করা ঘটনার উল্লেখ করলে মানুষের পক্ষে বাস্তব অবস্থা বোঝা সহজতর হয়।

ধরা যাক বীরভূম জেলার রামপুরহাট। রাজ্য বিধানসভার বর্তমান ডেপুটি স্পীকার একদা মন্ত্রী জনৈক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা অঞ্চল। বড় রাস্তার ধারে বগটুই গ্রাম। গ্রামের প্রবেশ পথেই পিলে চমকানো বিশাল প্রাসাদ। চোখ বন্ধ করা যাবে না তার আকৃতি এবং আয়তনে। স্তম্ভিত হতে হয় এমনই তার রূপ। মালিক কে?

গ্রামবাসীরা সাধারণভাবে প্রায় হতদরিদ্র। কোনক্রমে তাঁদের দিন গুজরান হয়। কিন্তু সেই ধরনের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখ। যে লোকটি পাঁচ বছর আগেও পথের ধারে মুরগী জবাই করতো। অথবা ভ্যান রিক্সা ঠেলতো কিংবা এদিক ওদিক করে কিছু উপার্জন করতো সেই ভাদু শেখ রাতারাতি রাজপ্রাসাদের মালিক। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বরাদ্দকৃত অর্থ অবাধে লুণ্ঠন না করলে এমন হতে পারে না। উপপ্রধানের লুণ্ঠনের অংশ যদি এত পরিমাণে হয় তাহলে প্রধানের কত? অনুমানের চেষ্টাও বৃথা।

অবশ্য কেউ বলতেই পারেন যে বীরভূম বলে কথা! সেখানে তো মহাবীর কেষ্ট মণ্ডলের খাসতালুক। তিনি অনেককাল কয়লা চুরি, পাথর চুরি, গরু চুরি, চাকুরি চুরি ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত। কারান্তরালে সেই মহাবীর প্রায় মুষিকে পরিণত। তাঁর অবশ্য পদচ্যুতি ঘটে নি। সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করলে যদি সবকিছু ফাঁস হয়ে যায় তাহলে, আসল রাজপ্রাসাদে ভূমিকম্প হতে পারে। সুতরাং তিনি পার্থ চ্যাটার্জী বা কুন্তল ঘোষদের মতো পদ হারাননি।

চুরির দায়ে ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত তাঁর মুখনিঃসৃত কথাই বীরভূম ও বর্ধমান জেলার একাংশে অকাট্য আইন ছিল। তিনি তো সপাটে বলতে পারতেন পুলিশের মাথায় বোমা মারার কথা। তৃণমূল সুপ্রিমোর আবার আদরের ছোট ভাই! তাঁর সম্পত্তি ইডি, সিবিআই বলছে হাজার হাজার কোটি টাকা। সুতরাং তাঁর সেনাবাহিনীর অন্যতম পাথর পাচারের সহযোগী ভাদু শেখ কমিশন হিসেবে রোজগার করেছে। বেচারা এমন দুঃখজনকভাবে অন্তর্দলীয় কোন্দলে মারা না পড়লে কেউ কি কিছু জানতে পারতেন?

পুলিশ অবশ্যই জানতো। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিশ্চিতই জানতেন। সাধারণ প্রশাসনের কর্তারাও নিশ্চয়ই জানতেন। কেউ কিছু বলেন নি। কারণ ভাদু শেখরাই এখন এ রাজ্যের অধিপতি। রাজরাজাড়া সম্পর্কে অকথা বলা মোটে ভাল কাজ না। ধরে মুণ্ডু থাকবে না।

রাজ্য জুড়ে যে এত খুনোখুনি, শয়ে শয়ে মানুষের অকালে ইন্তেকাল, সেসব কি এমনি হয়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুটের মালের বখরা নিয়ে গন্ডগোল। আর প্রতিবাদ করলে, এসব অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করলে আনিস খান করে দেওয়া হবে। কোনও বিচার হবে না। কাউকেই দোষী বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কিছুকাল বামপন্থীরা চীৎকার করবে। তাদেরও পিটিয়ে ভয় দেখানো হবে। তারপর সব চুপ। আনিস খানের মতো উন্নত মনের প্রতিবাদকারী কবরেই শুয়ে থাকবে। বিচার পাবে না।

এমন এক ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতেই হবে। ৮ জুলাই ভোটের দিন বা প্রচারের সময় বামপন্থীরা আক্রান্ত হতেই পারেন। মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ অনেককে জেলে পুরে দিতে পারে। কিন্তু রাজ্যের মানুষের স্বার্থে বামপন্থীদের থেমে গেলে চলবে না। লড়াইটা কঠিন হলেও মানবিক স্বার্থে বামপন্থীদেরই লড়তে হবে।

২০২৩-এ আর এস পি যে পঞ্চায়েত চায়

একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার অনিয়ম নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন সরগরম। পঞ্চায়েত ভোটের আগে চলছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক দোষারোপের পালা। কেন্দ্র বলছে, দুর্নীতি হয়েছে বলে টাকা দেওয়া হবে না। রাজ্য তুলছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ। তৃণমূল ও বিজেপি'র তরজার পালাগানে আড়াল হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রকল্পসহ পঞ্চায়েতের সব কাজে সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকারের প্রসঙ্গ। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রামবাসীকে যা দেওয়া হয়েছিল। দুই দলের তরজায় মনে হচ্ছে, এই সব কিছু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা দুর্নীতিবাজদের শাস্তি না দিয়ে গরীব মানুষকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে। সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দূরের কথা, মতামত জানানোরও কোনো অধিকার নেই। অথচ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ঠিক উল্টো হওয়ার কথা। সংবিধান, আইনের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক শত যোজন।

তৃণমূলের আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে একের পর এক অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা ধ্বংস করে তারা আমলাতন্ত্র ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বাড়াতে চায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তাই তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে তারা মানুষের ভোট দানের অধিকার অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। পাশাপাশি শাসক দলের মাতব্বররা ক্ষমতা পেয়ে মানুষের পঞ্চায়েতের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কেড়ে নিয়েছে।

এসবই হয়েছে আইনকে ফাঁকি দিয়ে এবং অমান্য করে। তৃণমূল সরকার খাতায় কলমে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত আইনকে মান্যতা দিয়েছে। সংবিধান অনুসারে তা না দিয়ে উপায় নেই। আইন অনুসারে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধে পাওয়ার জন্য মানুষকে সরকার বা শাসক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কথা নয়। বরং, প্রশাসনকেই সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে থাকার কথা। কেন্দ্র ও রাজ্যের কোনো সরকারি প্রকল্পই প্রশাসন বা শাসকের ভিক্ষার দান নয়। পঞ্চায়েতের মাথারা এসব আইন বিলক্ষণ জানেন। নিয়ম করে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়। প্রশিক্ষণের নামে মোচ্ছব কম হয় না। মাতব্বরেরা আইন যেমন বোঝেন, তার থেকেও ভালো বোঝেন আইনের ফাঁকগুলো। আইন কিভাবে অমান্য করা যায় এবং আইনের ফাঁককে ব্যবহার করা যায় তা তৃণমূল ভালোই রপ্ত করেছে। সরকারি বই কিংবা নির্দেশিকায় কিন্তু খুব ভালো ভালো কথা লেখা আছে। যেমন, ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের 'গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা : রচনা ও রূপায়ণের নির্দেশিকায় বলা হয় যে জনসাধারণই পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কর্মকর্তা। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্তারা সহযোগিতার ভূমিকা পালন করবেন (পৃ.১১)। সরকারি পরিভাষায় যাকে বলা হয় সহভাগী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে (২০১৮) নির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ বই প্রকাশ করেছিল। নাম : গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও পদাধিকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠোপকরণ, ২০১৮। প্রথম খন্ডে গ্রাম সভা, গ্রাম সংসদ, সামাজিক নিরীক্ষা থেকে শুরু করে উপসমিতি, পঞ্চায়েতর বিভিন্ন সভা কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বইয়ের ভূমিকাতেই বলা হয় যে, নির্বাচিত সদস্যদের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে নির্বাচিত সদস্যদের সেই কাজ করার কথা। কিন্তু, কার্যত তাঁরা চলেছেন বিপরীত পথে। বইয়ের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক অনেক।

গ্রাম সংসদ ও গ্রামসভা

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটারদের নিয়ে গ্রামসভা। প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বর মাসে গ্রামসভা করা আবশ্যক। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতর সব ভোটার সেই সভায় যোগ দিতে পারবেন। গ্রামসভার গ্রাম সংসদের সভার আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে মতামত দিতে পারবেন। এই সভার সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েতে পেশ করতে হবে। গ্রামসভায় পরের বছরের পঞ্চায়েতের বাজেট, সার্বিক পরিকল্পনা, অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যায়ের হিসেব, কাজের হিসেব, বিভিন্ন প্রকল্পে কারা সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের তালিকা গ্রামবাসীদের সামনে অবশ্যই পেশ করতে হবে। আইন অনুযায়ী গ্রামবাসীরা এগুলি নিয়ে মতামত জানাতে পারবেন এবং তাঁদের মতামত লিখে রাখতে পঞ্চায়েত বাধ্য।

গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার বৈঠকে যাতে সব গ্রামবাসী যোগ দিতে পারেন তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েতকে অন্তত সাতদিন আগে সভার নোটিশ জারি করে, মাইক প্রচার, লিফলেট বিলি, দেওয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কাছে সভার খবর জানাতে হবে। সঠিকভাবে প্রচার না করে চুপিসারে সভা করা আইন সম্মত নয়। (সূত্র : পৃ: ২৩-২৫)

বাস্তবে যা ঘটছে

বাস্তবে সভাগুলিতে মানুষের অংশগ্রহণ কমই থাকে। কারণ, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। তাই তাঁরা সভাগুলিতে যোগ দিতে উৎসাহ পান না। আবার সাধারণ মানুষের মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবেশও থাকে না। শাসক দলের রোষানলে হাতে ও ভাতে মার খাওয়ার ভয় থাকে। সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রাখার আশঙ্কা কাজ করে। শাসক দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদরাও প্রতিবাদ করলে প্রকল্পের সুযোগ না পাওয়ায় হুমকি প্রকাশ্যেই দেন। সেই হুমকি উপেক্ষা করে অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী হওয়া অনেক গরিব মানুষের পক্ষেই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- বহু জায়গায় গ্রাম সংসদ ও গ্রামসভার বৈঠকের খবর ঠিকমতো প্রচার না করার অভিযোগ ওঠে। গ্রাম সভার প্রচার হলেও, গ্রাম সংসদ নিয়ে প্রচার বিশেষ হয় না।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও পাড়া বৈঠকের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ বিশেষ থাকে না।

উপসমিতি

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ পরিচালনার জন্য পাঁচটি উপসমিতি গঠন করতে হয়। এগুলি হল–

আর এস পি'র বিকল্প সর্বজনীন উন্নয়নের রূপরেখা

১) এম জি এন আর আই জি এস-এর অধীনে

- অপুষ্ট শিশুদের পরিবারগুলিকে সম্পদ সৃষ্টির কাজে অন্তর্ভুক্ত করবে।
- বাল্যবিবাহ, নারী-শিশু পাচার, শিশু শ্রমিকের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাকে আটকাতে যে সকল পরিবারের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটছে তাদের চিহ্নিত করা ও এই প্রকল্পে সংযুক্ত করে নেওয়া।
- গ্রামের প্রকৃত দুঃস্থ পরিবারগুলোর দুঃখ দূরীকরণের লক্ষে এই প্রকল্পের অধীনস্থ বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচীর সাথে তাদের যুক্ত করবে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় এই প্রকল্পের অধীনে নার্সারি খুলে সারা বছর বাঁচে এমন চারা উৎপাদন করে তা পঞ্চায়েত এলাকার প্রকৃত দরিদ্রদের বিনা মূল্য সরবরাহ করবে।
- গ্রামীণ এলাকায় অপুষ্টি দূরীকরণের লক্ষ্যে অপুষ্ট পরিবারগুলিকে এমনারেগা-র অধীনে পাকা চৌবাচ্চা, ছোট ট্যাংক গড়ে মাগুর, শিঙ্গি প্রমুখ জিওল মাছের চাষ করার ব্যবস্থা করবে।
- এম জি এন আর ই জি এস-এর অধীনে ১০০ দিনের কাজ ছাড়াও 'আজকের মজুরী আগামীর জীবিকা' এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা রোজগার সুনিশ্চিত করবে।
- গ্রামে গ্রামে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কম খরচে চাষীদের জন্য গ্রীন হাউস তৈরীর পরিকল্পনা নেবে।
- চাষী, স্বনির্ভর দলগুলোকে কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, গহনা বাঁশ তৈরির সাথে সাথে মশলা বাগান, ওষধি গাছের বাগান, সুপারি, গোলমরিচ প্রমুখ চাষের উদ্যোগ নেবে। গ্রামীণ এলাকার নানান কুটির শিল্পের প্রসার, ভাঙ্গনরোধক ও হস্তশিল্পের সামগ্রী তৈরী, উন্নত গো-খাদ্য তৈরীর লক্ষ্যে ভেটিভার ঘাসের চাষ, চা শিল্পকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে চা বলয়ের গ্রামীণ এলাকায় নার্সারিতে চা গাছের চারা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হবে। চা বাগানগুলোতে শেড ট্রি হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে নানান অর্থকরী গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বিভিন্ন জনজাতির বাস রয়েছে। জনজাতিসমূহের পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতির নেতৃত্বে বয়ন ও তাঁত শিল্প দপ্তরের সহায়তায় জনজাতিদের মধ্যে যারা আগ্রহী তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে যুগ যুগ ধরে তারা যে কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন তার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২) কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ উপসমিতির অধীনে

বারো মাসের জৈব সবজি বাগান, বিভিন্ন প্রজাতির ডাল চাষ, দানা, তেল জাতীয় শস্য উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, স্থানীয় ফলের চারা উৎপাদন কেন্দ্র গঠন, কলম করার প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের পশুখাদ্য চাষ, জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রসার ঘটানো, কেঁচো, জৈবসার, কীটরোধক, তরল সার তৈরির প্রশিক্ষণ, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ, জমির উর্বরতা বুঝতে মাটি, লবণাক্ত এলাকায় সবজি চাষে সহায়তা প্রদান, ম্যানগ্রোভের চারা তৈরিতে সবরকম সহায়তা প্রদান, বিপর্যয় সহ্য করতে পারে এমন ধানের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ, অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করার সাথে সাথে খরা ও ভূমিক্ষয় এলাকায় সবজি চাষ, সমন্বিত ধান ও গম চাষ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ, পাকা সেচ নালা তৈরী, বছরে একবার পশু পাখি পিছু মাত্র ৫ টাকা অনুদান নিয়ে পশুপাখির টিকাকরণ প্রকল্প, চিকিৎসা শিবির, হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া পালনে সহায়তা প্রদান, উন্নত প্রজাতির পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র গঠন, পশুখাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণ, মাছের ডিম তৈরির প্রশিক্ষণ, মাছের চাষে সহায়তা, গ্রামে শস্যগোলা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পঞ্চায়েত এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেখানে, কৃষকদের গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে সমবায়

—এরপর ৬ পাতায়

২০২৩-এ আর এস পি যে পঞ্চায়েত চায়

৫-এর পাতার পর—

প্রথায় যৌথ চাষের ব্যবস্থা করা হবে। কৃষি উপকরণ থেকে ফসল বিক্রি সবই হবে যৌথভাবে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রকৃত কৃষকদের চিহ্নিত করে তাদের পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে। তাদের ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রির জন্য এবং তারা যাতে কৃষি দপ্তর থেকে চাষের উপকরণ পান তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পশুপালন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা এবং যৌথভাবে ফার্ম গড়ে মানুষ যাতে পশুপালন করতে পারেন তাঁর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করে তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে।

৩) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির অধীনে

গ্রামীণ প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও হাই স্কুল, মাদ্রাসা প্রমুখ বিদ্যালয়গুলিতে, এস এস কে, এম এস কে প্রমুখ প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারীদের সুস্বাস্থ্যবান করার লক্ষ্যে যে কাজগুলিকে আর এস পি অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যিক বলে মনে করে তা হল–

বিদ্যালয়ে এল.সি.ডি শো-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা, প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা, বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী, মানবিকতাবোধ সম্পন্ন নানান নীতিমূলক ঘটনা, গল্প দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পাঠক্রম মেনে চলা পঠন-পাঠনের মানোন্নয়ন নিয়ে পঞ্চায়েত ও বিদ্যালয়ের মধ্যে বছরে দুবার আলোচনার আয়োজন করা। বিদ্যালয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক সমিতি গঠন, সামান্যতম সাম্মানিকের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এরূপ জ্ঞানী-গুণীদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনমূলক কাজে উৎসাহিত করার কাজে ব্যবহার করা, পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষিত অথচ পূর্ণ বেকার এবং নানা বিষয়ে পারদর্শী এরূপ যুবক-যুবতীদের সম্মানজনক সাম্মানিকের ভিত্তিতে ব্যবহার করে 'বিদ্যালয় পরবর্তী বিদ্যালয়ে' নানান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী সহ পঞ্চায়েতের আগ্রহী জনগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সৃজন মেলা করা, ফুটবল টুর্নামেন্ট, বছরে একবার জনপ্রতি ২০ টাকার বিনিময়ে স্বাস্থ্য, চক্ষু ও রক্তপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা, বুক ব্যাঙ্ক তৈরী, জলবাহিত বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কর্মসূচী নেওয়া, শিশু শ্রমিক দূরীকরণে পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই উপসমিতির অধীনে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এমনভাবেই গড়ে তোলা হবে যেখানে সকল রোগ নির্ণয় করার যন্ত্রপাতির পাশাপাশি জটিল রোগ বা অস্ত্রপচার ব্যতীত যে কোনও ছোটখাটো রোগ নিরাময়ের জন্য যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকবে।

৪) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির অধীনে যে কাজগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা উচিত বলে আর এস পি মনে করে তা হল:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বা World Health Organisation-এর সূত্র অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টির মান নির্ণয় করা, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলি, SSK, MSK প্রমুখ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে বছরে অন্তত দুবার যৌথ আলোচনাসভার আয়োজন করা, বাল্যবিবাহ, নারী-শিশু পাচার, পণপ্রথা, স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী বিষয়ে বছতে অন্তত একবার পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী সকল ১১-১৮ বছরের কিশোরী ও তাদের মায়েদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৫) শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির অধীনে যে কাজগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে চলা উচিত বলে আর এস পি মনে করে তা হল:

রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকার নিজস্ব কিছু না কিছু সম্ভাবনার ক্ষেত্র আছে। প্রথমেই গ্রাম সংসদের সভাতে আলোচনা করে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করা। অতঃপর গ্রামসভা আহ্বান করে লিপিবদ্ধ করা সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা গ্রাম সংসদের সভা করে পঞ্চায়েতের অধিবাসীবৃন্দদের অবহিত করে গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র, কুটির ও হস্তশিল্প গড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও সরকারী ব্যাঙ্কের থেকে স্বল্প সুদে যাতে তারা ঋণ পান তার জন্য এই উপসমিতি উদ্যোগী হবে। এমনকি সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলির বিকাশ ঘটাতে সমবায় সমিতি গড়েও একাজ করার জন্য এই উপসমিতি উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রকৃত হস্তশিল্পী ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের চিহ্নিত করে তাদের পরিচয়পত্র প্রদান যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা যাতে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পান তারজন্য তাদের সহায়তা করা হবে।

৬) অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতিকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে যা করা উচিত তা হল:

ক) বিভিন্ন উপসমিতিগুলি যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করবে তা তাদের বাজেট সহ পেশ করতে বলা হবে। অতঃপর এই উপসমিতি সেই বাজেটের অর্থ বরাদ্দ করার বিষয়টি সুনিশ্চত করবে এবং তা প্রধান, উপপ্রধান, সচিবের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সভা করে তাদের জানিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের একটি তথ্যপঞ্জি তৈরী করতে উদ্যোগী হবে।

গ) জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলাশাসক, এসডিও, বিডিওদের সহায়তা নিয়ে রাজ্য সরকারের অধীনস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সাথে আলোচনা করে পঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শাখা স্থাপন করে একদিকে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করা এবং অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে একটি শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড় করানোর প্রয়াস নেওয়া হবে। আর এস পি মনে করে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে আমাদের রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগকে সার্থক করতে পারলেই আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি এক শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড় করানোর প্রক্রিয়া সফল হবে। যে সাফল্যের হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গে রাজস্ব খাতে আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং ধীরে ধীরে আমাদের প্রিয় বাংলা প্রকৃত স্বনির্ভর বাংলায় (গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রমুখ উন্নত রাজ্যের সাথে এক আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে) পরিণত হবে।

বাংলার সকল জনগণের কাছে আমাদের আবেদন কেবলমাত্র 'জয় বাংলা', 'বিশ্ব বাংলা'-র স্লোগান সর্বস্ব রাজনীতিকে বিদায় দিয়ে আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে মিশে পঞ্চায়েতী-রাজ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে সেই বাংলা গড়ে তুলি, যে বাংলায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজকের অনিশ্চিত জীবন-জীবিকার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে এক উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল জীবনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

'রাজনীতির জন্য মানুষ নন, মানুষের জন্য রাজনীতি'-কে সার্থক করে তুলতে ব্রতী হই।

১) অর্থ ও পরিকল্পনা, ২) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, ৩) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ, ৪) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, ৫) শিল্প ও পরিকাঠামো।

- অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন। প্রত্যেক উপসমিতিকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। সব গ্রামবাসীর কাছে মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। অন্য চারটি উপসমিতির মধ্যে সমন্বয় করে তাদের পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও কাজের তদারকিতে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দান।
- শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি সাক্ষরতার প্রচার ও প্রসার, শিশু, প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচি, মিড ডে মিল কর্মসূচি, পরিবেশ, জনশিক্ষা, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য বিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, নির্মল বাংলা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ নিয়ে কাজ করে।
- নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপসমিতি স্বনির্ভর দল, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, আই সি ডি এস, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা, নারী ও শিশু কল্যাণ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প, সমাজ কল্যাণ, সহায় কর্মসূচি, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিয়ে কাজ করার কথা।
- কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতির কাজের এক্তিয়ার হল, কৃষি, সবজি ও ফলচাষ, জলসেচ, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের আর্থিক প্রকল্প, মাছ চাষ, রেশম চাষ, গাছ লাগানো, ভূমিক্ষয় রোধ, কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা।
- শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি বিষয়, পরিকাঠামো উন্নয়ন, আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহ নির্মাণ, গ্রামীণ বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার নিয়ে কাজ করে।

(সূত্র : পৃষ্ঠা : ২০-২১)

গ্রামীণ উন্নয়নে উপসমিতিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে সঠিকভাবে কাজ করলে সর্বজনীন উন্নয়নের বিকল্প মডেল স্থাপন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই উপসমিতি সঠিকভাবে কাজ করছে না। নগদ টাকা এলেও বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের উপকরণ কেনার অর্থ আসে না। আবার অনেক সময় পঞ্চায়েতের সভাতেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রধান বা কয়েকজন মাতব্বর মিলে সব পরিকল্পনা নিচ্ছে। এমনিতেই উপসমিতির কাজে সাধারণ মানুষের অংশ নেওয়ার সুযোগ বিশেষ নেই। বরং উপসমিতির ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা, গ্রাম সংসদ, গ্রামসভার গুরুত্ব কমানো হচ্ছে। আবার কার্যত উপসমিতিগুলিরও ক্ষমতা কমিয়ে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির জন্য পঞ্চায়েত এলাকার সত্তর থেকে একশো জনকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দল (জি পি এফ টি) গঠিত হয়। নির্বাচিত সদস্য, পঞ্চায়েত কর্মচারী ছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠী, জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবীদের নিয়ে এই দল গঠনের কথা

(সূত্র : পৃ: ৮)।

সবই হয়। কিন্তু, দলবাজির জন্য মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটে না। শাসক দল বা পঞ্চায়েতের মোড়লদের ঘনিষ্ঠরাই এই দলে সুযোগ পান।

●●●

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে বামফ্রন্টের প্রস্তাব

৪ঠা জুলাই

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন,
১৮, সরোজিনী নাইডু সরণী,
কলকাতা-৭০০০১৭

বিষয় ঃ দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাব সম্পন্ন করা সম্পর্কিত

মহাশয়,

আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পর্বের শুরু থেকেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এই কাজে পুলিশের একাংশের প্রত্যক্ষ সংযোগে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের ভয়ঙ্কর অবনতি হয়েছে। রাজ্যে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত।

দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ বিরোধী প্রার্থীদের এমনকি, পরিবারের সদস্যদের হুমকি, মিথ্যা মামলা রুজু, গ্রেফতার ও পুলিশি হেফাজতে শারীরিক নিগ্রহ করে চলেছে। প্রতিটি আক্রমণ, সন্ত্রাসের ঘটনা বিডিও, এসডিও, বিভিন্ন স্তরের পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনকে বারে বারে জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা দ্বিগুণ উৎসাহে বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জেলায় জেলায় শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিপুল পরিমাণ বোমা মজুদ করেছে।

বিদেশে থেকেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যায় এবং গৃহীত হয়। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমার মধ্যে জমা না দিয়ে গোপনে শাসক দলের শ'য়ে শ'য়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। জাতি শংসাপত্র (Caste Certificate) পাওয়ার জন্য জমা দেওয়া আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে–সরকারি দপ্তর থেকে নানা অজুহাত দেখিয়ে স্ক্রুটিনীর তারিখ পার হওয়ার পর তা দেওয়া হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভোটকর্মী নিয়োগের ৯৬৪৬ পাতার তালিকা দুষ্কৃতীদের হাতে যাওয়া এবং ভোটকর্মীদের হুমকি দেওয়ার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। ব্যালট পেপার ছাপানোর পরে কমিশনের নির্দেশ মতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পান্ডুলিপি নষ্ট করে দেওয়ার বদলে বেশ কিছু জায়গায় নির্বাচন পরিচালনায় যুক্ত একাংশের আধিকারিক বা পুলিশ আধিকারিকদের সেগুলি রেখে দেওয়া এবং জাল ব্যালট ছাপানোর মতো গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনাই একাংশের নির্বাচনী আধিকারিক পুলিশ এবং শাসকদলের যোগসাজসে ঘটেছে।

এই সমস্ত দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের যে সমস্ত আধিকারিকরা যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালন ব্যবস্থায় দুর্নীতি আরও বেড়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনের প্রচারের সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ যুক্ত করা হয়েছে, অথবা প্রশাসনিক সভা দেখিয়ে নির্বাচনী সভা করা হয়েছে। নির্লজ্জভাবে MCC মান হয়নি।

আইনকানুনকে তোয়াক্কা না করার ফলে বারে বারে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমাগত আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে।

ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে এবং বিগত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের আশঙ্কা, নির্বাচনের দিনও দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ভোটদানে বাধা দিয়ে এবং বিরোধী প্রার্থী, পোলিং এজেন্টদের কাজে বাধা ও আক্রমণ করে শাসকদল বুথে বুথে অবাধে ছাপ্পা ভোট দিয়ে ভোট লুঠ করার অপচেষ্টা করবে।

এই পরিস্থিতিতে আমরা আপনার কাছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাজ্যের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরপেক্ষ, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছি–

১) অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় নজরদারি ও টহল দিতে হবে এবং পাশাপাশি ভোটের দিন প্রতিটি বুথের প্রবেশদ্বারের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তাদের বসিয়ে রাখা যাবে না বা শাসক দলের নির্দেশে পরিচালিত করা যাবে না।

২) কার্যকরী নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) নির্বাচনের আগেই সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের আইনানুগ পদ্ধতিতে আটক ও বেআইনি অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে।

৪) ভোটের দিন এলাকায় এলাকায় 'বাইক বাহিনী'র চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

৫) ৯৫ শতাংশ বুথে নয়, প্রতিটি বুথেই নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরী সিসিটিভি রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) নির্বাচন কর্মীসহ নির্বাচন চলাকালীন সমস্ত প্রার্থী ও এজেন্টদের নিরাপত্তা এবং ভোটাররা যাতে শান্তিতে, নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭) ভোটের আগের দিন ৭ জুলাই (P-1) DCRC থেকে পোলিং পার্টি বেরিয়ে যাওয়ার পর সেন্টারগুলি ফাঁকা থাকে। সেই সময়েও যাতে শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীকারীরা জাল ব্যালটে ছাপ মেরে সমগ্র ভোট প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও CCTV-র নজরদারি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮) ৮ জুলাই ভোটের পর পোলিং পার্টি ব্যালট বাক্স সহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র যখন DCRC তে জমা দেবেন, তখন সেই ব্যালট বাক্স ঠিক মত স্ট্রং রুমে ঢুকছে কিনা তা প্রদর্শনের জন্য CCTV এবং Video Recording সহ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। (বিগত নির্বাচনে Duplicate Ballot Box ঢোকানো হয়েছিল)।

৯) ৮ জুলাই থেকে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরী সিসিটিভি রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাযথ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রার্থীর প্রতিনিধিদের স্ট্রং রুম পাহারা দেওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০) স্ট্রং রুমের চাবি অবশ্যই Returning Officer- এর হেপাজতে রাখতে হবে।

১১) গণনা কেন্দ্রে কাউন্টিং হল সহ সর্বত্র CCTV'র নজরদারিতে রাখতে হবে। গণনা শুরুর আগে থেকে ফলাফল ঘোষণা এবং শংসাপত্র দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে। গণনার সময় ব্যালট বাক্স খোলা থেকে শুরু করে সিল করা পর্যন্ত প্রতিটি কাজ নিয়মানুসারে করতে হবে ও পেপার সিল ভাঙ্গা থাকলে বা অন্য কোনো বেনিয়ম থাকলে সেই ব্যালট বাক্স বাতিল করতে হবে। Distinguishing Mark ও প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরবিহীন কোন ব্যালট বৈধ নয়–তা বাতিল করতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে কোনোভাবেই এক মুহূর্তের জন্য আলো বন্ধ না হয় (বিগত নির্বাচনে এই ঘটনা ঘটেছে)।

১২) গণনাকেন্দ্রে কাউটিং এজেন্ট সহ যাঁদের প্রবেশের অনুমতি থাকে তাঁদের প্রবেশের ক্ষেত্রে যাতে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করা না হয় তারজন্য RO- কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের অনুরোধ, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে আপনি ভারতের সংবিধান ও পঞ্চায়েত নির্বাচনী আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ধন্যবাদ সহ
(বিমান বসু)
সভাপতি
বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে বামপন্থী মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি দল

গত ২৮ জুন পঞ্চাতে নির্বাচনে সন্ত্রাস, মহিলাদের উপর আক্রমণ, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা প্রভৃতি আট দফা দাবির ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন চারটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনারের কাছে দেওয়া হয়। তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত একটি সুসজ্জিত মহিলা মিছিল নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো থেকে যাত্রা করে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। তারপর আটজনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দিতে যান। সেখানে নির্বাচন কমিশনারের কাছে সমস্ত বিষয়টি তুলে ধরা হয়। একদিকে যেমন আক্রমণ চলছে অন্যদিকে তেমনিই মিথ্যা মামলা ও প্রলোভন দেখানো চলছে। নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তাতে এ ধরনের অনৈতিক কাজ কখনো চলতে পারে না। তথাপি মহিলারা ভয় না পেয়ে নতিস্বীকার না করে প্রতিরোধ করছেন। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের কম. অঞ্জনা বর্মন, AIDWA র কম. সোমা দাস সহ বহু মহিলা আক্রান্ত। ফলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি মহিলা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে করা হয়। কমিশনার জানান, এ ধরনের ঘটনা অভিপ্রেত নয়। এ ধরনের ঘটনা বন্ধ হওয়ার জন্য তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বলা হয় এই ভয়ানক অবস্থা বন্ধ করতে কমিশন সচেষ্ট না হলে জনগণ তার হাতে আইন তুলে নেবে যা অভিপ্রেত নয়। পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে রাজ্যের মানুষ স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের উপর নির্ভর করছে। আশা করা যায় নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে। এই প্রতিনিধি দলে কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কম. তপতী ভাদুড়ী, কম. কনীনিকা ঘোষ, কম. শ্যামশ্রী দাস, কম. ডলি রায়, কম. অঞ্জু কর প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Vol. 70 Issue No. 34 শনিবার, ৮ জুলাই ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পানিহাটি পৌরসভার দুরবস্থা

রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিতে গর্বিত পানিহাটি। মা মাটি মানুষ ও উন্নয়নের নামে ২০১৩ সালে প্রতিশ্রুতির বন্যা, টলিউডের একাধিক শিল্পী সহ তৃণমূলের কুখ্যাত নেতৃত্বের রোড শো ও মিথ্যা ভাষণ এবং কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করে। পৌর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজয় নিশ্চিত জেনেও সন্ত্রাস সংগঠিত করে পানিহাটির প্রতিটি ওয়ার্ডের সব বুথে পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে যথেচ্ছ পরিমাণে ভোট লুট করে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দুবৃত্তপ্রধান দলটি। পানিহাটি পৌরবোর্ড গঠনের পর সমস্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের লুট ও কাটমানি, তোলাবাজি'র পথ প্রশস্ত করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে সুসুজ্জিত লুম্পেন বাহিনী তৈরি করে এরা। এই বাহিনীর মাধ্যমে পানিহাটিতে ব্যাপক হারে খুন, জখম, রাহাজানি, মদ ও জুয়ার আসর বসিয়ে যুব সমাজকে বিপথগামী করার রাজনৈতিক অভিসন্ধির মাধ্যমে সামাজিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে এই লুম্পেন বাহিনীর মাধ্যমে লোকসভা, বিধানসভা কি পৌরসভার প্রতিটি বুথে ভোট লুট সংগঠিত হয়ে চলেছে। নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি তথ্য নিচে দেওয়া হলঃ–

১) প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্যের ক্ষমতায় তৃণমূলের সরকার পৌরসভায় তৃণমূলের বোর্ড গড়লে ছয় মাসের মধ্যে জমা জলের সমাধান করা হবে। অথচ তৃণমূলের দশ বছরের শাসনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২) বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। কোনো প্রযুক্তির প্রকল্প রূপায়ন হয়নি।

৩) প্রতিনিয়ত নিকাশি নালা পরিষ্কার করলে নিকাশি ব্যবস্থাকে সুগম করলে মশা মাছির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অথচ ছয় মাসে একবার করে ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য শ্রমিক ভাইদের পাঠানো হয়।

৪) পানিহাটির বেশিরভাগ মূল রাস্তাগুলোতে প্রতিবছর ভাঙ্গা ইট দিয়ে রোলার করে দায় সারা হয়। যদিওবা কোনো কোনো রাস্তা কংক্রিটের বা পিচের হয় তাহলে কাটমানির প্রভাবে তার আয়ু মাত্র তিন থেকে ছয় মাস।

৫) রাস্তার পোস্টের আলোর পৌরসভার বিদ্যুৎ বিভাগের দুর্নীতিতে অন্ধকারে পথ চলাই জীবন পৌরবাসীর।

৬) কুকুর গরু মহিষ সহ অন্যান্য পশুর মৃতদেহ সৎকার করার দায়িত্ব বর্তমান পৌরবোর্ড ছেঁটে ফেলেছে। নিজ নিজ দায়িত্বে জনসাধারণকে পশুর মৃতদেহ বহন করতে হচ্ছে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও বিপজ্জনকভাবে তা করতে হচ্ছে।

৭) বাম পৌরবোর্ডের সময়কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌরসভার পরিষেবায় ধার্যকৃত কর এবং সার্ভিস চার্জের ঠেলায় নাগরিকের নাভিশ্বাস উঠছে।

ক) পৌরসভার ন্যূনতম ট্রেড লাইসেন্স চার্জ বেড়ে হয়েছে ২০০ টাকার ফি ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার্জ তো ২০০০০ থেকে ৪০০০০ টাকা। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই দপ্তর।

খ) নাইট সয়েল চার্জ ৪১০ টাকা থেকে বেড়ে হলো ২০০০ টাকা। দীর্ঘ সময় এই কাজ ৪/৫ হাজার টাকার বিনিময়ে খড়দহ পৌরসভার মাধ্যমে করা হতো।

গ) আবেদন পত্র/ফর্ম-এর মূল্য ১০ টাকা থেকে বেড়ে হলো ১৫ ও ২৫ টাকা।

ঘ) মিউটেশন ও বাড়ির নকশা পাশ করাতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ভ্যালুয়েশানের ১ শতাংশ ধার্য করা। এরপর তার উপর Chairman Relief Fund এর নামে টাকা সংগ্রহ করে। এখানেও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। সবাই বলেন এ আর নতুন কি?

ঙ) পানীয় জলের গভীর সঙ্কটে পৌরবাসীর নাজেহাল অবস্থা। গঙ্গার জল পরিশোধন করে ২৪ ঘণ্টার জল প্রকল্প বাম পৌরবোর্ডের সময়কালে ৭৫ শতাংশ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজও রূপায়ণ করতে ব্যর্থ।

চ) সর্বোপরি পৌরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে পানিহাটি সংবাদ মাধ্যমের শীর্ষে। পানিহাটির যুবক যুবতীরা প্রতারিত হলো। এভাবেই বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে।

ছ) পানিহাটি পৌরসভার পরিষেবাকে নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্য আগরপাড়া, ঊষুমপুরে একটি আঞ্চলিক দপ্তর (Regional Office) বামফ্রন্টের পৌরবোর্ডের সময়কালে তৈরি করে কিছু পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছিল। বর্তমান বোর্ড পরিচালকগণ এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, পৌরসভার কর্মীবর্গদের Punishment Department করেছেন বলে শোনা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু অযোগ্য কর্মী দ্বারা পরিচালিত সুষ্ঠু পরিষেবা দেবার মানসিকতা বদলে দুর্নীতিই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ বেলা ১২টায় আসে ২টায় চলে যায়। আঞ্চলিক দপ্তরটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সুষ্ঠু পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা হোক। Regional Office-এ অনুপ্রেরণার ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। নির্লজ্জতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই বোর্ড গঠনের পর কোনোরকম কাজ করেনি।

জ) পৌরসভার আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাম পৌরবোর্ডের সময়কালে State Bank of India কে আগরপাড়া, ঊষুমপুরে কার্যালয় তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হয়। মাসিক কম বেশি তিরিশ হাজার টাকা ভাড়া পান। পাশে ''মন্দাক্রান্তা'' অনুষ্ঠান ভবন তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হয়। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে তার কোনোরূপ সংস্কার করা, নতুন রং করে তৎসহ আজকের বাস্তবতায় সৌন্দর্যায়ন করলে ও Air Condition করা হলে প্রতিনিয়ত ভাড়া পাওয়া যাবে, পৌরসভারও আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অব্যবহৃত বাড়িগুলো পরিকল্পনা মাফিক সংস্কার করে ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করা হলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পৌরবাসীগণ সুবিধা পাবেন।

ঞ) আগরপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকার কিশোর/কিশোরী ও যুবক/যুবতীদের জন্য বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন বাম পৌরবোর্ডের সময়কালে তৈরি করা হয়েছিল। ফেন্সিং দিয়ে ফুটবল গ্রাউন্ড ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের আগমনে ফেন্সিং তুলে দেওয়া হলো। তিনি নির্বাচন এলে স্টেডিয়ামের প্রতিশ্রুতি দেন। বর্তমান মাঠের বেহাল অবস্থা। চারিদিকে তাস খেলার আসর, তৃণমূলী ও পুলিশি বন্দোবস্তে সাট্টার বোর্ড চলছে। নতুন ব্যবস্থা দোকান বসিয়ে তোলার আমদানি।

ট) আগরপাড়ার প্রাণকেন্দ্র ঊষুমপুর আজ অপসংস্কৃতির ও অপরাধমূলক কাজের আখড়া হয়ে উঠছে। বন্ধ করতে প্রশাসনের নজরদারি ও জনগণের ঐকমত্য এবং জোটবদ্ধ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভীষণ জরুরী।

ট) ঘোলা মাতৃসদন হাসপাতাল বাম পৌরবোর্ডের সময়কালে তৈরি একদা জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগে ও প্রসূতি বিভাগে সহ সাধারণ বিভাগ দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। আজ অন্তঃসারশূন্য বিল্ডিংটুকু নিষ্ঠুর পরিহাস করছে।

পানিহাটি পৌরসভার নাগরিক সমাজই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ১২৩ বছরের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে।

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক
গণবার্তা
মহাশয়,

২৪ জুন ২০২৩-এ গণবার্তায় প্রকাশিত একটি খবরের প্রেক্ষাপটেই এই চিঠি। 'সমস্ত অত্যাচার ও সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই পঞ্চায়েতে আর এস পি প্রার্থীদের পরিসংখ্যান' এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি খবরের বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরিসংখ্যানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরএসপি'র যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায় সন্ত্রাসের জন্য কোনো প্রার্থী দেওয়া যায়নি।

মাননীয় সম্পাদক, এই সংবাদ আমাকে অবাক করেছে ও কোন সূত্রের মাধ্যমে এই খবর আপনারা সংগ্রহ করলেন তাও জানতে আগ্রহী। কেননা একথা আমরা সকলেই জানি বর্তমান সরকারের আমলে আমাদের রাজ্যে খুন সন্ত্রাস অব্যাহত আছে এবং এই সন্ত্রাস প্রতিরোধে বামপন্থীদের সংগ্রামও অব্যাহত আছে।

এই সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় যতদূর জেনেছি সিপিএম এই জেলার মোট আসনের ৬৫ শতাংশ আসনে ও সিপিআই ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিটি দল প্রায় ২৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন; এমন কি বিজেপিও বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দিয়েছেন।

অর্থাৎ রাজ্যের সব বিরোধী দল যখন এই জেলায় প্রার্থী হতে পারলেন তখন আরএসপি একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারল না, সেটা কি কেবল মাত্র সন্ত্রাসের কারণে! হাওড়ায় প্রার্থী দেওয়া যায় নি হতেই পারে, হয়ত সাংগঠনিক কোনো কারণ ছিল। কিন্তু কুড়মি আন্দোলনের জন্য প্রার্থী দেওয়া যায় নি এরকম কোনো খবর প্রচার মাধ্যমেও সেভাবে প্রকাশিত হয়নি।

গণবার্তার নিবিষ্ট ও আগ্রহী পাঠকেরা এই সংবাদে যাতে কোনোভাবেই বিভ্রান্ত না হন, সেদিকে নজর দিতে সবিশেষ অনুরোধ করছি।

সুবীর ভৌমিক
রানাঘাট, নদীয়া

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-